



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 65 - 71

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

চিত্রকল্পের প্রয়োগ : প্রসঙ্গ ‘বীরাঙ্গনা কাব্য’

ড. মধুরা চক্রবর্তী

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

বিবেকানন্দ কলেজ, ঠাকুরপুকুর

Email ID : madhurakolkata@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Beerangana
Kabya,
Madhusudan,
Imagery,
Literature,
Tragedy, The
Ramayana,
Fate, Letters.

Abstract

Madhusudan Dutta spoken about the inevitability of its application in literature in his own words several times. ‘Beerangana Kabya’ is a valuable example of this. However, the trend of considering imagery as an independent element is not a very old one. In the world of the criticism of poetry, the reference to Caroline Spurgeon inevitably comes up on this subject. He shed the light on this subject in the thirties of the twentieth century. And in the context of image he meant ‘every kind of simile’ and ‘every kind of what is really compressed simile- The world of Madhusudan Dutta’s literature is full of imageries. He has repeatedly metaphor’. Again in the forties, Cecil Day Lewis spoke about the imageries being ‘metaphorical’, On the other hand, Renne Walleck again identified it somewhere as a comparison, somewhere as a description. On the other hand, Robin Skelton had divided images into different categories in the book ‘Poetic Pattern’ - 1. Simple Image 2. Abstraction 3. Immediate Image 4. Diffuse Image 5. Abstract Image 6. Combined Image 7. Complex Image 8. Combined Abstract Image 9. Complex Abstract Image and 10. Abstract Combined and Abstract Complex Image / And based on the senses he had divided images into five categories- Visual, Auditory, Olfactory, Gustatory, Tactile.

We can come to a conclusion that the meaning of images in literature is multidimensional. And to study Madhusudan’s literature, one must focus in this matter. In this context, our discussion will be on ‘Beerangana Kabya’. We have tried to analysis the uses of imagery based on the text. We have extracted the texts of the letters written by Shakuntala, Tara and many others to discuss this. The imageries have been used to express the emotions and somehow themselves have become a character of the text.

Discussion

মধুকবির সাহিত্য জুড়ে চিত্রকল্পের বিপুল বিস্তার। নিজস্ব চিঠিপত্রে বারোবারেই সাহিত্যে এর প্রয়োগের অনিবার্যতা বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন তিনি। ‘বীরাঙ্গনা কাব্য’ এরই সার্থক নিদর্শন। তবে চিত্রকল্পকে স্বতন্ত্র উপাদান হিসেবে ভাবার অভিমুখ খুব পুরনো দিনের কথা নয়। কাব্য সমালোচনার জগতে এই বিষয়ে ক্যারোলিন স্পার্জনের প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবেই আসে।

যিনি বিশ শতকের তিনের দশকে প্রথম আলোকপাত করেন এই বিষয়ে। এবং ‘ইমেজ’ অর্থে ‘every kind of simile’ এবং ‘every kind of what is really compressed simile-metaphor’-কে বোঝালেন।^২ আবার এর পরবর্তীকালে অর্থাৎ চারের দশকে সিসিল ডে লুইস জানালেন চিত্রকল্পের কোথাও না কোথাও ‘metaphorical’ হওয়ার প্রসঙ্গ।^৩ এই বিষয়ে রেনে ওয়ালেক আবার কোথাও এটিকে ‘description’, কোথাও বা ‘metaphor’ হিসেবে চিহ্নিত করলেন।^৪ অর্থাৎ কোথাও তুলনাধর্মিতা, কোথাও বা বর্ণনাধর্মিতা – চিত্রকল্পের প্রসঙ্গে এহেন বৈশিষ্ট্যগুলি সংযুক্ত থেকেছে বারবারেই। তবে এই প্রসঙ্গে এজরা পাউণ্ড কথিত ‘intellectual and emotional complex in an instant of time’^৫ ধর্মী বৈশিষ্ট্যের কথাও মনে রাখতেই হয়। একই সঙ্গে মনে রাখা জরুরি যে কাব্যের এবং নাটকের চিত্রকল্পের অন্তর্গত পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে ‘সংগত প্রতিমা’ প্রবন্ধে শঙ্খ ঘোষ জানিয়েছিলেন যথাক্রমে অনুলম্ব (Vertical) এবং অনুভূমিক (Horizontal) ভঙ্গি এবং স্থান প্রয়োগ (Static) ও গতিময় (Dynamic) প্রয়োগের কথা।^৬ আসলে চিত্রকল্প বা প্রতিমার বিন্যাস হয়ে থাকে নানাবিধ। ‘Poetic Pattern’ (১৯৫৬) গ্রন্থে রবিন স্কেলটন ইমেজকে বিন্যস্ত করেছেন দশটি শ্রেণিতে – 1. Simple Image 2. Abstraction 3. Immediate Image 4. Diffuse Image 5. Abstract Image 6. Combined Image 7. Complex Image 8. Combined Abstract Image 9. Complex Abstract Image এবং 10. Abstract Combined and Abstract Complex Image।^৭ আবার প্রচলিত দৃষ্টিকোণ থেকে ইন্দ্রিয়নির্ভরতার ওপর ভিত্তি করে এটিকে পাঁচটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করার রীতিটিও প্রচলিত। যেমন- দৃষ্টিনির্ভর (Visual), শ্রুতিনির্ভর (Auditory), ঘ্রাণনির্ভর (Olfactory), স্বাদনির্ভর (Gustatory), স্পর্শগ্রাহ্যময় (Tactile)।^৮ অর্থাৎ চিত্রকল্পের ব্যঞ্জনা বহুমাত্রিক। মধুসূদনের সাহিত্যের রস উপলব্ধির ক্ষেত্রে চিত্রকল্পের প্রতি স্বতন্ত্র অভিনিবেশ অনিবার্য। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত থাকবে ‘বীরাঙ্গনা কাব্য’-এর প্রতি। পাশাপাশি এই প্রসঙ্গে ভাবতে হয় চিত্রকল্পের তাৎপর্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গের অবতারণার গুরুত্ব।

‘বীরাঙ্গনা কাব্য’-এর প্রথম চিঠিতে স্বামীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত শকুন্তলার যন্ত্রণার প্রকাশক হয়ে উঠেছে এর চিত্রকল্পও। ‘আশামদ’, ‘ভ্রান্তিমদ’- একই চিঠিতে ব্যবহৃত দুই চিত্রকল্প ব্যবহৃত হয়েছে দুটি ভিন্ন শব্দের সংযোগে। শকুন্তলার কাছে ‘আশা’ এবং ‘ভ্রান্তি’- এই দুটি শব্দ কোথাও একই অর্থ বহন করে নিয়ে আসে যেন। তার জীবন যেন সেই বার্তাই দিয়ে যায় পাঠকের কাছে। এই প্রয়োগ তারই ইঙ্গিতবাহী। একই প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় সোমের প্রতি তারার পত্রেও (ভ্রান্তিমদে মাতি, / সপত্নী বলিয়া তারে গঞ্জিতাম রোষে/ প্রফুল্ল কুমুদে হুদে হেরি নিশাযোগে/ তুলি ছিঁড়িতাম রোষে)। অন্যদিকে দশরথকে লিখিত কেকয়ীর পত্রে ব্যবহৃত হয়েছে ‘কামমদ’ শব্দটি। (কাম-মদে মাতি যদি তুমি/ বৃথা আশা দিয়া মোরে ছলিলা, তা কহ, - / নীরবে এ দুঃখ আমি সহিব তা হলে’/)। অর্থাৎ ‘মদ’ শব্দের বহুমাত্রিক প্রয়োগ নিহিত রয়েছে বিভিন্ন অংশে। আবার এই চিঠিতে ‘সুধা’ এবং ‘মধু’ শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে একাধিক ক্ষেত্রে (পরিমল সুধা, মদনের দাস মধু, মধুলোভী অলি)। স্বাদনির্ভর অর্থাৎ Gustatory Imageryর এহেন প্রয়োগ লক্ষণীয় একাধিক পত্রে। যেমন, তারার কাছেও সোমের কণ্ঠস্বর তুলনীয় হয়েছে একই অনুসঙ্গে। (‘মধুর স্বর’, ‘চির-মধু-মাখা! সুধানিধি’) দুশ্মন্তের বিহনে শকুন্তলার অন্তর্গত বেদনার প্রকাশক এই অংশটি। এই বেদনার প্রকাশ তীব্রতর হয় পরস্পর বিপরীত চিত্রের প্রয়োগে (শুনি কোকিলের গীত, অলির গুঞ্জর, শ্রোতোনাদ; মরমরে পাতাকুল নাচি; কুহরে কপোত, সুখে বৃক্ষশাখে বসি, প্রেমলাপে কপোতীর মুখে মুখ দিয়া।^৯)

‘মেঘনাদবধকাব্য’-এর ন্যায় বিস্তৃত পরিসরে রাজকীয় অনুসঙ্গে চিত্রকল্পের প্রয়োগ না ঘটলেও এই কাব্যে তা দুর্লক্ষ্য নয়। প্রথম পত্রিকাতেই শকুন্তলার মানসপটে উদ্ভাসিত হয় দুশ্মন্তের না দেখা রাজপাট। পিতৃমাতৃস্নেহবঞ্চিতা আশ্রমকন্যা শকুন্তলার হৃদয়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রিয়তমের হৃদয়ে স্বীকৃতির আকাঙ্ক্ষাকে সূচিত করে এই প্রয়োগ। যিনি একই সঙ্গে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত। শকুন্তলার কল্পনায় রাজসভার দীর্ঘ এবং বিস্তৃত ছবির প্রকাশ কোথাও এই দুই নরনারীর অবস্থানগত পার্থক্যকেই সূচিত করে। এই অনুসঙ্গে এই পত্রে এসেছে ‘স্বর্ণ-রত্ন-সংঘটিত’, ‘সুবর্ণসন’, ‘স্বর্ণসিংহাসন’-এর মতো শব্দের সচেতন প্রয়োগ। স্বর্ণভারময় এই অতুল বৈভবের একাধিক উল্লেখ এবং তার বিপরীতে আশ্রমবালা শকুন্তলার সঙ্গে ‘অনাথিনী’, ‘বননিবাসিনী’, ‘বাকলবসনা’ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ সেই পার্থক্যকে স্পষ্ট করে

তোলার সচেতন প্রয়াস নিঃসন্দেহে। লক্ষ্য করবার বিষয়, শকুন্তলার লিখিত পত্রে যেভাবে এই শব্দগুলি প্রযুক্ত হয়েছে, কেকয়ীর দশরথকে লিখিত পত্রে সেখানে এহেন শব্দ অনুপস্থিত। কারণ শকুন্তলার ন্যায় কেকয়ী রাজার এই কন্যার কাছে রাজকীয় মহিমার উদ্ঘাটন কোনো অভিনব বিষয় নয়, তাঁর নিজস্ব অবলম্বন হিসেবে রয়েছে পিতৃগৃহের নিরাপদ আশ্রয়। যার ইঙ্গিত রয়েছে সংশ্লিষ্ট পত্রের শেষাংশে। বরং এই পত্রে তাঁর বক্তব্য বিষয় স্বতন্ত্র। আবার এরই পাশাপাশি প্রকৃতিসম্মত চিত্রকল্পের নিদর্শন লক্ষ্য করা যায় যথেষ্ট। যেমন, শকুন্তলার লিখিত পত্রেই রয়েছে, ‘শোন, পত্র;- সরস দেখিলে/ তোরে, সমীরণ আসি নাচে তোরে লয়ে/ প্রেমামোদে; কিন্তু যবে শুখাইস কালে/ তুই, ঘৃণা করি তোরে তাড়ায় সে দূরে;-/ তেমতি দাসীরে কি রে তাজিলা নৃপতি?’ কিংবা ‘কি লোভে ধাইবে/ আর মধুলোভী অলি এ মুখ নিরখি,-/ শুখাইলে ফুল, কবে কে আদরে তারে?’/ এহেন প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় গ্রন্থভুক্ত অন্য পত্রিকাতেও। নারীর অসহায়তার অনবদ্য চিত্র প্রকাশ পেয়েছে এই অংশে। এহেন প্রয়োগ রয়েছে অন্যান্য পত্রিকাতেও। তবে তার ভঙ্গিমা স্বতন্ত্র। কেকয়ীর লিখিত পত্রটি এই প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবেই আমাদের মনে পড়ে। শকুন্তলার লিখিত পত্রে যেখানে তার অসহায় আর্তি প্রকাশ পেয়েছে, সেখানে কেকয়ীর লিখিত পত্রটির ভঙ্গিমা হয়ে উঠেছে তির্যক। চিত্রকল্পেও তারই ইঙ্গিত বর্তমান। আপন শরীরের বর্ণনা দিয়েছেন এই নারী এইভাবে, ‘না পড়ি ঢলিয়া আর নিতম্বের ভরে!/ নহে গুরু উরু-দ্বয়, বর্জুল কদলী/ সদৃশ! সে কটি, হায়, কর-পদ্মে ধরি/ যাহায়, নিন্দিতে তুমি সিংহে প্রেমাদরে,/ আর নহে সরু, দেব! নম্র-শিরঃ এবে/ উচ্চ কুচ! সুধা-হীন অধর! লইল/লুটিয়া কুটিল কাল, যৌবন ভাঙারে/ আছিল রতন যত; হরিল কাননে/ নিদাঘ কুসুম-কান্তি, নীরসি কুসুমে!’ - লক্ষণীয়, এই অংশে বিগতযৌবনা কেকয়ীর নিজের শরীরের বর্ণনা আসলে উপস্থাপিত হয়েছে পুরুষের দৃষ্টিতে। যে পুরুষ তাঁর স্বামী। এবং তাঁরই কামোদ্ভবতার প্রকাশক হয়ে উঠেছে এই অংশ। তীব্র শ্লেষ, হতাশা এবং অভিযোগ যেন এই চিত্রকল্পের নির্যাস। এই অনুঘর্ষেই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে ‘রসময়ী নারী-ধন’, কিংবা ‘কামমদ’-এর মতো শব্দ। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যায়, পত্রনায়িকারা কোথাও নিজেদের পর্যবেক্ষণ করেছেন তাঁদের প্রিয় মানুষটির দৃষ্টিতে। আবার কোথাও অন্য নারীকে। সুরপুরে অবস্থানকারী অর্জুনকে দ্রৌপদী তাঁর ‘সুখ’ভোগের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন - ‘পীনপয়োধরা ঘৃতাচী’, ‘সু-উরু রম্ভা’, ‘নিত্য-প্রভাময়ী স্বয়ম্প্রভা’, ‘নিবিড়-নিতম্বী সহা’ কিংবা ‘সুলোচনা সুলোচনা’র প্রসঙ্গ। অর্থাৎ কোথাও অসহায়তা, কোথাও ধিক্কার, আবার কোথাও-বা শরীর হয়ে উঠেছে নিজেদের অথবা অন্য নারীর কাছে আবাহনের ইঙ্গিত। সূর্যনখা লক্ষণকে লিখেছেন, ‘আইস মলয়-রূপে; গন্ধহীন যদি এ কুসুম, ফিরে তবে যাইও তখনি!/ আইস ভ্রমর-রূপে; না যোগায় যদি/ মধু, এ যৌবন-ফুল, যাইও উড়িয়া/ গুঞ্জরি বিরাগ-রাগে!//’ ইন্দ্রিয়নির্ভরতার নানাবিধ নিদর্শন রয়ে গিয়েছে এই অংশে। ঘ্রাণনির্ভর (Olfactory) এবং স্বাদনির্ভর (Gastatory) চিত্রকল্পের সার্থক প্রয়োগ এটি। আপন শরীর যেন কোথাও প্রিয় পুরুষের দৃষ্টিতে যোগ্যতা নির্ধারণের মাপকাঠি হয়ে উঠেছে এই অংশে। যার মাধ্যম হয়ে উঠেছে চিত্রকল্পের এই বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রয়োগ।

‘মেঘনাদবধকাব্য’ বিষাদের মহাকাব্য। সমগ্র কাব্য জুড়ে তাই কবি রচনা করেছিলেন এক বিশ্বজাগতিক বিষাদ সঙ্গীত। নিয়তির নির্ধারিত পথেই আসলে অগ্রসর হতে থাকে চরিত্রেরা। তাই কাব্যে রাবণ যেন ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত থেকেও জারি রাখেন আপন সংগ্রাম। সমালোচক জগন্নাথ চক্রবর্তী এখানে লক্ষ্য করেছেন ‘ট্রাজিক আয়রনি’র সুর।^১ যেখানে রাবণ বলে ওঠেন ‘কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে,/ কে কবে শুনেছে, লোক মরি পুনঃ বাঁচে?’, সেখানে ‘ম্যাকবেথ’ নাটকের শেষেও আমরা দেখি তিনি সত্যিই অরণ্যকে এগিয়ে আসতে দেখলেন ডানসিনেনের দিকে। অর্থাৎ নিয়তি থেকে পরিত্রাণের উপায় মেলে না যেন কোথাও। চরিত্র আর নিয়তির এই সংযোগ অনিবার্য। ‘বীরাঙ্গনা কাব্য’-এ দুর্খোধনের প্রতি ভানুমতীর লিখিত পত্রে রয়েছে সেই মহাকাব্যিক যুদ্ধ বর্ণনার অনুঘর্ষ। এবং তার সঙ্গে জুড়ে থাকে সেই ট্রাজেডির সুর। তিনি কোথাও পরিণতি সম্পর্কে অবহিত, আর তাই তাঁর চিঠি জুড়ে বেজেছে বিষাদগাথা। স্বামীর কুরুক্ষেত্রে গমনপর্ব থেকেই তিনি হারিয়েছেন আহার-নিদ্রা। এবং রাজোদ্যান থেকে গৃহচূড়া - সব জায়গা থেকেই উৎকর্ষিত হয়ে দেখতে থাকেন রণক্ষেত্রের চিত্র। আর সেই অনুঘর্ষে ঘটেছে চিত্রকল্পের প্রয়োগ। ‘রেণু-রাশি গগন আবরে/ ঘন ঘনজালে যেন জ্বলে শর-রাশি, বিজলীর ঝালা সম ঝলসি নয়নে!// শুনি দূর সিংহনাদ, দূর শঙ্খ-ধ্বনি,/ কাঁপে হিয়া থরথর’/ মহাকালের অমোঘ পরিণতির ইঙ্গিত লক্ষণীয় ভানুমতীর এই বক্তব্যে। দৃষ্টিনির্ভর চিত্রকল্পের এই প্রয়োগ আলোর অনুঘর্ষ বহন করে আনলেও তার মাত্রা আদ্যন্ত নঞর্থক পরিণতিরই ইঙ্গিতবাহী। শঙ্খ মঙ্গলময়তার প্রকাশক হয়েও

ভানুমতীর কাছে তা সম্পূর্ণ বিপরীত মাত্রা যোজন করেছে যেন। ফলে সেই ধ্বনি তাঁর হৃদয়ে জন্ম দিয়েছে আশঙ্কার। এবং কোথাও এই পত্রে তিনি যেন দুর্ঘোষনের বিবেকের পর্যায়ে অধিষ্ঠিত। এবং সিংহনাদ যুদ্ধের অনুষ্ণের বাহক হিসেবে উচ্চারিত। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য, জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলার লিখিত পত্রেও রয়েছে সিংহনাদের অনুষ্ণ। ‘ক্ষুধাতুর সিংহ ঘোর সিংহনাদে/ ধরে যবে বনচরে, কে তারে তাহারে?’/ তবে এই পত্রে সিংহের চিত্রকল্পের মধ্যে দিয়ে যুদ্ধের অনুষ্ণের চাইতেও যেন অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে ক্ষমতার মাত্রা। এবং এই প্রয়োগ এক্ষেত্রে কোথাও সম্ভাব্য পরিণতির ইঙ্গিতবাহক। যা এক্ষেত্রে অনিবার্য। নৈতিকতার দিক থেকে কোথাও স্বামীর কৃত কর্মকে তিনি অন্তর থেকে সমর্থন করতে পারেন না পরিণতি সম্পর্কে ধারণাবোধ থেকে, অথচ তাঁর প্রতি রয়েছে এক গভীর শ্রদ্ধাবোধ এবং প্রেম - এই সুগভীর দ্বন্দ্ববোধ তাড়িত করেছে এই নারীকে - যা অনুরণিত হয়েছে গোটা পত্র জুড়ে। তাই যুদ্ধ সূচিত হবার পরেও তিনি যেন তাঁর এই ব্যক্তিগত পত্রে স্বামীকে উপলব্ধি করানোর জন্য ব্যগ্র আপন কৃতকর্মের দায়। এই ক্ষেত্রেও ঘটেছে চিত্রকল্পের প্রয়োগ- ‘গঙ্গাজল-পূর্ণ ঘটে, হায়, ঠেলি ফেলি,/ কেন অবগাহ দেহ কর্মনাশা-জলে?’ কিংবা ‘অবহেলি দ্বিজোত্তমে চণ্ডালে ভকতি?’ এই প্রয়োগ ভারতীয় সংস্কৃতিপ্রসূত। এবং গোটা পত্র জুড়ে ভানুমতী উন্মোচন করেছেন নিজের দৃষ্টিতে তাঁর প্রিয়তমের একের পর এক আত্মধ্বংসের প্রক্রিয়া - মহাভারতীয় উপাখ্যানের সেই ঘটনাপরম্পরার বিবরণ - যা কালপ্রবাহের অনিবার্য নিয়মে তাঁকে নিমজ্জিত করতে চলেছে ট্র্যাজেডির গর্ভে। মহাকাব্যজাত বৈশিষ্ট্য যেন এই অংশে ধারণ করেছে পত্রখানি। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য। বহিরাঙ্গিক দৃষ্টিশক্তির পরিবর্তে অন্তরাঙ্গিক দৃষ্টিরই গুরুত্ব এখানে বেশি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সঞ্জয়ের দিব্যদৃষ্টির মধ্যে দিয়ে মহাভারতকার এঁকেছেন প্রত্যক্ষ চিত্র। মহাকাব্যের এই বৈশিষ্ট্য যেন প্রকাশ পেয়েছে এই পত্রেও। একের পর এক যুদ্ধের ছবি এঁকেছেন মধুসূদন। এই পত্রেও। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের। ফলে তা জন্ম দিয়েছে বৈচিত্র্যপূর্ণ একের পর এক চিত্রকল্পের। তাতে রাজকীয় ঐশ্বর্যের মহিমা যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে যুদ্ধের ভয়াবহতা। সর্বোপরি, এই পত্র করুণরসের। ভানুমতী প্রমীলার ন্যায় স্বামীর কর্মে গর্বিত নন, কিন্তু ক্ষত্রিয় এই কূলবধু স্বামীর ‘ক্রটি’ সংশোধন করতে বদ্ধপরিকর। সংশ্লিষ্ট পত্রের শেষাংশে রয়েছে পত্রনায়িকার স্বপ্নদর্শনের প্রসঙ্গ। রাত্রিকালীন সেই স্বপ্নে ভানুমতীকে দর্শন দিলেন দেববালা। এহেন প্রয়োগ মধুসূদনীয় সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায় বারেকারেই। ভবিষ্যতের ঘটনার ইঙ্গিত বপন করে দেন যেন তিনি কাহিনির মূলে। দেববালার ভানুমতীর উদ্দেশ্যে বক্তব্য এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য - ‘বৃথা খেদ, কুরুকূলবধু,/ কেন তুমি কর আর? কে পারে খণ্ডাতে/ বিধির বাঁধন, হায়, এ ভবমণ্ডলে?’/ প্রাসঙ্গিকভাবে স্মরণ করা যায়, মেঘনাদবধকাব্যে একাধিকবার এসেছে স্বপ্নের প্রসঙ্গ। প্রথম সর্গে রাবণের বক্তব্য (‘স্বপনসম তোর এ বারতা,/ রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে/ কাতর, সে ধনুর্ধরে রাঘব ভিখারী/ বধিল সমুখরণে’), তৃতীয় সর্গে রাম এবং বিভীষণের বক্তব্য (‘স্বপন আজি দেখি নি কি জাগি?’/ এবং ‘নিশার স্বপন নহে এ, বৈদেহী-নাথ, কহিনু তোমারে’/) তার সার্থক নিদর্শন। আবার এই সূত্র ধরেই, সংশ্লিষ্ট পত্রে ভানুমতীর বক্তব্যটি স্মরণ করা যেতে পারে, ‘শৃগাল কি কভু/ পারে বিমুখিতে, কহ, মৃগেন্দ্র সিংহেরে? / সুতপুত্র সখা তব? কি লজ্জা নৃমণি,/ তুমি চন্দ্রবংশচূড়, ক্ষত্রবংশপতি?’/ অনুরূপ দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায় মেঘনাদবধকাব্যে প্রমীলার কণ্ঠেও - ‘নাহি মারি অস্ত্র মোরা তোর সম জনে/ ইচ্ছায়। শৃগাল সহ সিংহী কি বিবাদে?’/ বীরত্ব এবং কাপুরুষতার ব্যঞ্জনা বহনকারী এই প্রয়োগ। এই দুই নারীই দুই ভিন্ন অর্থে হয়ে উঠেছেন বীরঙ্গনা। কুরুকূল এবং রক্ষ-কূল বংশের দুই দৃষ্ট বধু গর্বিতা এবং প্রবল আত্মসচেতন আপন বংশগরিমা সম্পর্কে। ভানুমতী তাই বারেকারে দুর্ঘোষনকে স্মরণ করিয়ে দেন আপন আভিজাত্যের কথা।

মধুসূদনের সাহিত্যে একাধিক চিত্রকল্প ব্যবহৃত হয়েছে বিভিন্ন মাত্রায়। বিভিন্ন অনুষ্ণে। এটি তাঁর সাহিত্যের এক পরিচিত বৈশিষ্ট্য। যেমন ‘মেঘনাদবধকাব্য’-এর চতুর্থ সর্গে আমরা বন্দিনী সীতার অনুষ্ণে পেয়েছি পিঞ্জরবদ্ধ পাখির চিত্রকল্প - ‘সুবর্ণ - পিঞ্জর বলি হয় কি লো সুখী/ সে পিঞ্জরে বদ্ধ পাখী? দুঃখিনী সতত/ যে পিঞ্জরে রাখ তুমি কুঞ্জ-বিহারিণী!’ এই নারী ছিলেন অপহৃত। পরভূমে বন্দিনী। ঠিক বিপরীতে অবস্থা করছেন বৃহস্পতি-পত্নী তারা। স্বামীর সঙ্গে অতিবাহিত করেছেন দীর্ঘ দাম্পত্যজীবন। কিন্তু সেই আপাত-সুখের একত্রবাস তাঁর কাছে যেন হয়ে উঠেছে কারাবন্দী জীবনেরই তুল্য। ‘কুলের পিঞ্জর ভাঙ্গি, কূল-বিহঙ্গিনী/ উড়িল পবন-পথে, ধর আসি তারে,’/ অর্থাৎ কূল এখানে পিঞ্জরতুল্য। যে কুলের মর্যাদা সগৌরবে ঘোষণা করেছেন প্রমীলা বা চিত্রাঙ্গদা, সেই কূল এখানে তারার কাছে বদ্ধতার নামান্তর। অর্থাৎ

চিত্রকল্পের মাত্রা এখানে ভিন্নতর ব্যঞ্জনা লাভ করে। আবার পত্রের অন্তিম পর্যায়ে উপনীত হয়ে সেই পিঞ্জরের চিত্রকল্প পুনরাবৃত্ত হল। ‘পোষা পাখী, পিঞ্জর খুলিলে,/ চাহে পুনঃ পশিবারে পূর্ব কারাগারে!’ যেন এক বৃত্ত সম্পূর্ণ হল এই সূত্র ধরে। সোমদেব তাঁর কাছে যে মুক্তির নামান্তর হিসেবে ধরা দেন পত্রের সূচনায়, সেই মুক্তি যে আসলে তাঁর অধরা – এই বাস্তব সত্যে তারা উপনীত। ধরা দেয় তা এই চিত্রকল্পের প্রয়োগে যা পুনরাবৃত্ত হয়েছে পুরুরবার প্রতি উর্বশীর পত্রও – ‘যার উড়ি ও পদ-আশ্রয়ে/ পিঞ্জর ভাঙিলে উড়ে বিহঙ্গিনী যথা/ নিকুঞ্জ! কি ছার স্বর্গ তোমার বিহনে?’ অর্থাৎ অর্জুনের বিহনে উর্বশীর কাছে স্বর্গবাসও হয়ে উঠছে কারাবাসেরই তুল্য। পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির ন্যায় যাপিত তাঁর এই স্বর্গবাস। আবার তারার মননের গোপন সংবাদ আমরা পাই এমনই এক চিত্রকল্পের আশ্রয়ে। সোমদেবের আগমনের পূর্বে যা ছিল ‘মুদিত কমল-দল’-এর তুল্য, তাঁর আগমনের পরবর্তী পর্যায়ে তা-ই প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল নব কুমুদিনীর মতোই। পুষ্পের অনুষঙ্গে তারার বিবর্তিত মনস্তত্ত্ব ধরা পড়ল শৈল্পিক পরিসরে – ‘যে দিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে/ প্রবেশিলা, নিশাকান্ত, সহসা ফুটিল/ নবকুমুদিনীসম এ পরাণ মম উল্লাসে,- ভাসিল যেন আনন্দ-সলিলে’। এই প্রয়োগগুলি পুনরাবৃত্ত হয়েছে একাধিক পত্রে। বিভিন্ন অনুষঙ্গে। যেন এক সংযোগসূত্র রচিত হয়ে চলেছে বিভিন্ন পত্রের মধ্যে এভাবেই – বিভিন্ন প্রতিবেশে। উর্বশীর লিখিত পত্রে প্রযুক্ত হয়েছে পুষ্পকেন্দ্রিক চিত্রকল্প – ‘রহিনু মুদিয়া আঁখি শরমে, নৃমণি;/ কিন্তু এ মনের আঁখি মীলিল হরষে,/ দিনান্তে কমলাকান্তে হেরিলে যেমতি কমল’। বিবর্তিত নারী মনস্তত্ত্বের এক রূপরেখা অনবদ্যভাবে ধরা দিল এই প্রয়োগে। প্রেমময়তার অনুষঙ্গে। নারীসুলভ কমনীয়তার প্রয়োজনে এই প্রয়োগ। আবার পূর্বোক্ত পত্রের ‘আনন্দ-সলিল’-এর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় দশরথকে লিখিত কেকয়ীর এবং দ্বারকানাথকে লিখিত রুক্মিণীর পত্রও। যথাক্রমে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক পর্বে অযোধ্যাবাসীর (কেন আজি পুরবাসী যত/ আনন্দ-সলিলে মগ্ন?) এবং কৃষ্ণের জন্মালগ্নে গোপ-দম্পতির (মহারত্নে পাইলে যেমতি/ আনন্দ-সলিলে ভাসে দরিদ্র, ভাসিলা দম্পতি আনন্দ-সলিলে), গোকুলে গোপ-দম্পতির আনন্দের আতিশয্যের অনুষঙ্গে। যাই হোক, তবু এই আনন্দ তারার হৃদয়ে স্বল্পকালের জন্যই বসত গড়েছে। সোমদেবের প্রত্যাবর্তনের পরে এই বিরহিণী দাবানলের বনস্থলীর মতোই দগ্ধ হয়ে চলেছেন প্রতিনিয়ত। কোথাও অগ্নি পবিত্রতার বার্তাবাহক, কোথাও বা ধ্বংসের।

জয়দ্রথকে লিখিত দুঃশলার পত্রে রয়েছে অজাগর প্রসঙ্গ (‘কাল অজাগর-গ্রাসে পড়িলে কি বাঁচে প্রাণী?’)। প্রাসঙ্গিকভাবে আমাদের মেঘনাদবধকাব্যের কথা উল্লেখ করতে হয়, প্রমীলার উক্তিতে লক্ষ্য করা যায়, ‘ওই দেখ, আইল লো তিমির যামিনী,/ কাল-ভুজঙ্গিনী-রূপে দংশিতে আমারে।/’ এখানে তা নিছক রাত্রির ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে না, বরং মেঘনাদের সম্ভাব্য মৃত্যুর দ্যোতক। আমাদের আলোচ্য পত্রও দুঃশলার কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয় জয়দ্রথের মৃত্যুর ইঙ্গিত। এটি মধুসূদনের বয়নকৌশল। সেই অমোঘ নিয়তির সুর। এই অমোঘ নিয়তিগাথা নির্মাণ করেছে শান্তনুকে লিখিত জাহ্নবীর পত্রখানি। আপন পুত্রের অমিত বিক্রম এবং শৌর্যের পরিচয় দিয়েছেন জাহ্নবী – ‘নদপতি সিঙ্কুনদ; বন-কুলপতি/ খাণ্ডব; রথীন্দ্রপতি দেবব্রত রথী -/ বশিষ্ঠের শিষ্যশ্রেষ্ঠ!’ এই প্রয়োগ দেবব্রতের শৌর্যের বিশালতাকে সূচিত করে। আপন বংশের গরিমা কোথাও যেন মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা বহন করে আনে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, নীলধ্বজকে লিখিত জনার পত্রে পত্রনায়িকা স্বামীকে স্মরণ করিয়ে দেন মহারথি প্রথা – বংশের আভিজাত্যময় গৌরবগাথা – ‘চণ্ডালের পদধূলি ব্রাহ্মণের ভালে?/ কুরঙ্গীর অশ্রুবারি নিবায় কি কভু/ দাবানলে?’ প্রায় অনুরূপ সুর শোনা যায় মেঘনাদবধ কাব্যেও – ‘নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তরুরে?/ চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে!’ দুটি কাব্যেই – দুটি ক্ষেত্রেই আমরা লক্ষ্য করছি চরিত্রের মুখে শোনা যাচ্ছে স্বজাত্যবোধকে উদ্দীপিত করার কথা। যার মধ্যে দিয়ে যেন ধরা পড়ে সমকালীন পরাধীন ভারতবাসীর আপন জাতি কিংবা গোষ্ঠীর গৌরব রক্ষা করার প্রচেষ্টার চিত্র। সে পুরুষ হোক, কিংবা নারী – বীরত্বের বোধের প্রকাশে উভয়েই কোথাও একাত্ম হয়ে যায় – স্থান-কাল-নির্বিশেষে। একই চিত্রকল্পের প্রয়োগে এভাবেই বিভিন্ন চরিত্র – বিভিন্ন প্রতিবেশ – বিভিন্ন সৃষ্টি যেন গ্রথিত হয়ে যায় একই সুরে। এক অখণ্ডতার বোধে। আসলে মধুসূদনীয় সাহিত্যে চিত্রকল্পের প্রয়োগ বহুমাত্রিক বিশ্লেষণের প্রত্যাশী।



Reference:

১. কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে মধুসূদন একবার নিজের কবিতা সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'In reading over my poem, you must look - 1st to the imagery, 2nd to the language in which those images and thoughts are expressed; 3rd to the individual flow of each verse'. প্রাসঙ্গিক ভাবে উল্লেখ করা যায়, সংশ্লিষ্ট পত্র রচনার কোনো তারিখ আমরা পাইনি।
২. 'Shakespeare's Imagery and what it tells us, Caroline F.E. Spurgeon, Cambridge University Press, 1935 (1st Ed), P. 5
৩. C. Day Lewis. 'The Poetic Image'. Ninth Impression. Jonathan Cape, Thirty Bedford Square, London, 1958, p. 18
৪. Welleck, Rene, and Austin Warren, 'Theory of Literature', Third Edition, London, Penguin Books, 1963, p. 190
৫. Eliot, T.S. (Ed.), 'Literary Essays of Ezra Pound', Faber and Faber, p. 4
৬. ঘোষ, শঙ্খ, "সংগত প্রতিমা", শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ/৫', দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৬৮
৭. Skelton, Robin, 'The Poetic Pattern', Routledge and Kegan Paul, p. 90-91
৮. এই প্রসঙ্গেই আমাদের মনে পড়ে সংবেদী চিত্রকল্পের (Synaesthetic Imagery) প্রসঙ্গ। এই চিত্রকল্প এক ইন্দ্রিয়জ ধারণা থেকে যাত্রা করে অন্য ইন্দ্রিয়জ ধারণার দিকে। 'Synaesthesia' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন জুলস মিলেট তাঁর 'Audition Coloree' সংক্রান্ত গবেষণায়। আবার প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যায় যে এই শব্দটি সম্পর্কে 'Dictionary of Literary Terms and Literary Theory' গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'The mixing of sensations, the concurrent appeal to more than one sense; the response through several senses to the stimulation one'.
৯. চক্রবর্তী, জগন্নাথ, 'মেঘনাদবধ কাব্যে চিত্রকল্প', প্রতিভাস, কলকাতা, পৃ. ২১

Bibliography:

সহায়ক গ্রন্থ :

- অমলেন্দু বসু, 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' (প্রথম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, বাণীশিল্প, ফেব্রুয়ারি ২০০৮
- গোলাম মুরশিদ, 'আশার ছলনে ভুলি', পঞ্চম মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারি ২০১৬
- কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রকাব্যে চিত্রকল্প', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, অভী প্রকাশন, ১৩৮২
- জগন্নাথ চক্রবর্তী, 'মেঘনাদবধ কাব্যে চিত্রকল্প', প্রথম প্রতিভাস সংস্করণ, কলকাতা, প্রতিভাস, জানুয়ারি ২০২৩
- ড. সাধনা রায়, 'মধুসূদন সাহিত্যে প্রাচ্য প্রভাব', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, সাহিত্যলোক, অক্টোবর ১৯৯৮
- তাপস ভৌমিক (সম্পাদক), 'মাইকেল মধুসূদন'। প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, কোরক, জানুয়ারি ২০২৩
- 'মধুসূদন রচনাবলী', ষষ্ঠ মুদ্রণ, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, আগস্ট ২০১২
- শঙ্খ ঘোষ, 'শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ (৫)', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জুলাই ২০০২
- সন্দীপ দত্ত (সম্পাদক), 'মাইকেল মধুসূদন দত্তঃ ফিরে দেখা', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১১ জানুয়ারি ২০২৩
- শিরিকুমার দাশ, 'প্রবন্ধসংগ্রহ', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০২২
- C. Day Lewis, 'The Poetic Image', Ninth Impression, Jonathan Cape, Thirty Bedford Square, London, 1958
- Dinah Birch & Katy Hooper (Ed.), 'Oxford Concise Companion to English Literature', Fourth Edition, London, Oxford University Press, October 2011
- H. Coombes, 'Literature and Criticism', Reprinted, London, Penguin Books, 1987
- J.A. Cuddon, 'The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory', Reprint, London, Penguin Books, 1999

Mircea Eliade (Translated by Philip Mairet), 'Images and Symbols', First Edition, London, Harvill Press, 1961

Rene Welleck and Austin Warren, 'Theory of Literature', Third Edition, London, Penguin Books, 1963

Robin Skelton, 'The Poetic Pattern', Second Impression, Routledge and Kegan Paul, 1957

সহায়ক পত্রিকা :

অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী (সম্পাদক), 'নন্দন' পত্রিকা (মাইকেল মধুসূদন চর্চা), ৫৯ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, জুন ২০২৪

সনৎ সিংহ (সম্পাদক), 'বার্তা' পত্রিকা (মাইকেল মধুসূদন দত্ত দ্বিশতবার্ষিকী সংখ্যা), অষ্টাদশ বর্ষ, জানুয়ারি ২০২৪

অমলকুমার মণ্ডল (সম্পাদক), 'কবিতীর্থ' পত্রিকা (মাইকেল মধুসূদন দত্ত সংখ্যা), বিয়াল্লিশতম বর্ষ